বাহাস

সাদ কামালী

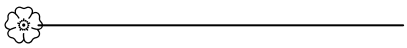

ধানহাটের দক্ষিণে গোরস্তান, উত্তরে কুমারনদের ছেড়াখোড়া অসম্পূর্ণ একটা বাঁক, পুবে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পুব পশ্চিমমুখি ইটের রাস্তা চলে গেছে থানা পর্যন্ত। আর আরজ ফকির ইট বিছানো রাস্তার পাশে বসে ধানহাটায় আসা-যাওয়া মানুষ ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে গল্পগুজব ঠাট্টা-তামাসা করে। হাতের একতারায় টুনটুন খুনসুটি করে গান ধরে। বিশেষ করে বিবি তারামনকে নিয়ে গান করলে তার চোখের তারা, ঠোঁটের হাসি, গলার স্বর, একতারার বাজনা কেমন আলাদা হয়ে ওঠে। চেনা-পরিচয়ের মানুষ জানে, অচিন মানুষও কিছুসময় দাঁড়ালে বুঝতে পারে আরজ ফকিরের স্বরান্তর, কাঁটাঘেরা বাগানের মথিত হওয়ার বেদনা। গান শেষে কেউ কেউ বিশ্রামমুহূর্ত পর জানতে চায়, দেহা অয় নাই ? জুয়ান পুরুষ তুমি বউছাড়া থাকবার পার কেমায় ! আরজ ফকির ঠোঁটে হাসি জড়িয়েই রাখে, এইসব হাহাকার, খোঁজখবরে বিব্রত হলেও মুখে ভাসিয়ে তোলে না। বরং ঠাট্টা-তামাসা করে গান ধরে। অথবা গানের বাহানা করে –

জুয়ান মানুষ কামের ফানুস
প্রেমের নেশায় মরে
জীবন যৈবন কাঙাল হাউস
কিসের আসায় ঘুরে !
আরজ ফকির কামেল মানুষ
নারীর শরীর ভজে
কামের ভিতর শরিয়া বেহুস
আরজ কেমনে মজে !

তারামন বিবির শরীর, গোটা একখান মেয়েলোক – কেমন ভাপ ছড়ায়। আরজ ফকিরের মন উচাটন শুধু বায়বীয় ভাবেই নয়, ভাবদর্শন ভণিতা না হলেও পুরা সত্য নয়। গানের চালে কথার ছলে শুধু শরিয়াবাদীদের শরীর প্রেমিক বলে গেলেই হবে না। ফকিরের ঘনঘন লম্বা শ্বাসের হেতু খুঁজে দেখলে সবই খোলসা হয়ে যাবে। হয়তো যাবেও না। ফকিরের কথাই খোলসা করা যায় না তার আবার শ্বাসবায়ু ! ফকির যেমতো ভাঙে, যে যে অক্ষর শব্দ কথার মানে বুঝিয়ে দেয়, ততটুকুই সার। নিজে নিজে বুঝতে গেলে শুধু নিজেকেই তামাসার পাত্র করে তোলা হয় হাটভর্তি মানুষের সামনে। আরজ ফকির সব মানে ভাঙে না। কিছু কিছু অর্থ নিজের জন্য দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে রেখে পান খাওয়া দাঁত বের করে হাসে। এই হাসির ছোঁয়ায় কেমন করে চোখে পানি ভাসে। চোখের পানিও তখন চিকচিক করে হেসে ওঠে।

তারামন বিবির গ্রাম ফুলসুতি, ফুলসুতির মুন্সিবাড়ি। সামান্য বরগা চাষ আর ঘরামি মজুর এখলাস মুন্সি তার আব্বা। তারামন বিবি ডাকে আব্বাজান। ছোট ভাইদুটি অবশ্য আব্বাই বলে। এখলাস মুন্সির প্রতিবেশী জ্ঞাতিভাই তালেব মুন্সির সাথে আরজ ফকিরের ভাব অনেক কাল থেকেই। ফকিরের সে ভক্ত। জুম্মায় জুম্মায় তালেব মুন্সি মসজিদে মাথা ঠুকলেও ফকিরের কথা ও গানে ডুবে যেতে বাধে না, পায়ের তলে মাটি না পেয়ে নাকেমুখে পানি ঢুকিয়ে খাবি খায়, কিন্তু সাঁতরাতে পারে না, সাঁতরাতে হয়তো চায়ও না। বাতেনি দুনিয়ার মাথামুণ্ড ছাড়া কথাবার্তায় ডুবতে ডুবতে বেঁচে থাকার মধ্যে বুক কাঁপানো আনন্দ আছে। সাঁতরাতে শিখে ফেললে, মুরিদ হয়ে গেলে অপঘাতের রস কি পাওয়া যাবে ! আরজ ফকির নিজেও তাকে মুর্শিদ ধরতে বলে না। মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলে, ভোদাই মানুষ দুই নায়ে পাও দিয়া ভাবে খুব চালাকি মারলাম। তুমি কিন্তু ভোদাইও না, আবার চালাকও না। তালেব মুন্সি হাঁটু ভেঙে বসে, দুই হাঁটুর ওপর লুঙির কিনার, তার ফাঁক দিয়ে শরীরের গোপন উঁকি দেয়। থুতনিতে বাঁ হাত ঠেকিয়ে থাকলে ঠোঁট দুটি কেমন করে হা হয়ে থাকে। সেই হা-এর ভিতর সব দাঁত নাই। বলে, আমি তাইলে কি ? তুমি হইলা গাছি। এই আরেক ধাঁধা। মানে কি হলো ? তালেব মুন্সি মানে জানতে চায় না, সেইরকম বসেই চোখে আলাদা রকম চাহনি বানায়। ফকির তার অর্থ বোঝে। একতারায় সুর তুলে গানে গানে বলবে, না ন্যাংটা কথায়..., চোখ বুজে চোখ খোলে। বলে, গাছি হইলো ফলভোগী, যে বাতেনি সুধাও খায়, খেজুর গাছের জাহিরি দেহেরও সেবা যত্ন করে তার ডালপালা কামে লাগায়, কাইটা খরি করে। গাছির কাছে জাহিরি গাছটাই সত্যি না, গাছের নরম আগা চাইছা চাইছা ভিতরের রস টাইনা নেয়। কুনো মোল্লারে জিগাও, ভাই, খেজুর গাছ কেমুন ? উত্তর পাবা,

কাটাআলা ডালপাতা, চিকন একখান গাছ, আল্লার যেমুন হুকুম। আর গাছি কবে, ঢক মতো চাছতে পারলে সুমিষ্ট, আবার কামেও লাগে। তালেব মুন্সি থুতনি থেকে হাত সরিয়ে হাঁটুর ভাঁজে কোলের ভিতর নিয়ে ফকিরকে উস্কানি দিয়ে আরও কথা শোনার মতলব করে। আরজ ফকির নিরাশ করে না। শত হলেও এই একটি মানুষ তার তারাবিবিকে শুধু স্নেহের নজরেই রাখে না, মাঝে মাঝে এখলাস মুন্সির আড়ালে গোপন সলাও দেয়। সেইসব খুবই গোপনের কথা। ফকিরি সাধনার বাতেনি তরিকার মতোই রহস্যঘেরা।

তালেব মুন্সি হাটে হাটে তারামন বিবির খবর আনে, দুজনের কথা, না-বলা কথাও লেনদের করে। ফকিরি তরিকায়, যৌবনের দাম আছে। সংসারেরও, কাম সুখের রসে রসে ঘুরবে, ঘুরতে ঘুরতে রস থিতিয়ে ফেনা তুলে মোক্ষম ঘি হয়ে উঠবে। সেই দরজায় যদি শিকল পরিয়ে দেয়া হয় তবে মন্থনহীন মোক্ষ কোথায় মিলবে ! বেশরা ফকিরদের বেঈমানের দোষই নয়, সেই সঙ্গে কামুক চরিত্রহীন বেতমিজের দোষও আছে। আরজ ফকির মুর্শিদের বায়েত হলেও নিজের গ্রাম বামনকান্দা, ভাঙ্গারহাট আর ফুলসুতি গ্রামেই চলা চলতি করে বেশি। ধানহাটে সে নিয়মিত, তালেব মুন্সি ছোটখাটো বেপারি। হাটে ধান কিনে হাটেই বেচতো আগে। এখন পুঁজি নাই, গায়ের বলও ক্ষয়ে গেছে। শুধু গেরস্তের বাড়ি থেকে ধান কিনে সেই ধান ভিজিয়ে সিদ্ধ করে নিজের ঢেঁকিতে চাল কুটে ধামা ভরে হাটে নিয়ে আসে। হয়তো তালেব মুন্সির কারণেই আরজ ফকির ধানহাটায় মজলিস জমাতে শুরু করেছিল। ফকিরকে ঘিরে কিছু কিছু ছেলে-ছোকরাও বসে বসে ঝিমায়। ফকিরের কথা শুনতে না ঝিমাতে আসে কে জান। ঝিমায় গাঁজার দোষে। ফকিরদের নেশা-ভাঙের বদনাম থাকলেও আরজ ফকির পান সাথে বাবা জর্দা ছাড়া আর কোনো নেশার বন্দি হয়নি। অথবা সে আমুল নেশাতেই বন্দি, ফকিরি নেশা। গিরস্তের ছেলে কে কবে ফকির হতে চায় যদি নেশার দোষ না ঘটে ! কি মধুর কষ্টের নেশা ! দুঃখে ডোবা সুখের নেশা। ফকির না হলেও দুঃখ থাকতো। মুসলমান গিরস্তের তার ভাই-ব্রাদারদের মতো বরগা চাষ, পরের জমিতে শরীর বেচা, মজুর নয়তো খুব হলে নুন-তেল-বিড়ির একচালা মুদি। বরং ফকির হয়েই তার লাভ হয়েছে বেশি। সংসারের আরও কতকিছু শরিয়া-বাধ্যতা থেকে নিজের মতো করে মুক্তি পেয়েছে। শরীরের শ্রম থেকে চিন্তাভাবনার অকুলে ঠাঁই খোঁজার নিরন্তর যাত্রায় গভীর সুখ, কষ্টভরা সুখ হলেও সুখে শখে ভেসে বেড়ানো। নিরাকার শূন্যে মাথা ঠোকার চেয়ে চাক্ষুষ মুর্শিদের ভজনা, ভাবের লেনদেন, তত্ত্বের গোমর, সত্যদর্শনের নেশা কত আনন্দের। এই আনন্দের যাত্রা গিরিখাতে ভরা বলেই, শাপ শৃগালের হামলা আছে বলেই এতে আনন্দও বেশি। দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মজা আলাদা। খোদা পয়গম্বরে ফকিরের অবিশ্বাস নাই। বিশ্বাসের পথ শুধু অন্যরকমের। শূন্যতার ছলনা তারা বোঝে। ছলনাই বৈকি। নিরাকার খোদায় পাঁচ পাঁচবার মাথা নোয়াবার পর সেই নিরাকারের সাথেই কোনো পয়গম্বর মানুষ দেখা করে ফিরেন কিভাবে ? ফকিরের এই প্রশ্ন কখনো প্রশ্নাতীত ভাব নয়, তবুও প্রশ্ন করা দোষের। সেই দোষের ফতোওয়াও বড় নির্মম।

আসমানের অনেক সিঁড়ি
অনেক তালার ঘর
ঘরের পরে অযুত বাড়ি
দুরের বাড়ির পর

আল্লাতালার আরশ বেদি
আসন বসন তার
মহাপ্রভুর রসুল যিনি
দেখতে পেলেন পাড়।
নিরাকারের আকার ভাই
মানুষ রসুল দেখে
নাই দেহের আদল নাই
কেমনে মানুষ শিখে ?

মানুষ সেরা রসুল সত্যি
দেখেন তাহার আল্লা
আমি ফকির মুর্শিদ ভজি
তিনিই আমার হিল্লা।

খোদা নবী দুই সত্যি
মিথ্যা কিছু নয়।
মিথ্যা শুধু অলীক বয়ান
খোদার আকার হয়।

মুর্শিদ আমার আসন করেন
আকার সমেত কিতাব পড়েন।

আছরের ওয়াক্ত, মাদ্রাসা মদসজিদের মোয়াজ্জিন বেলাল হুজুর কোমরে হাত ঠেকিয়ে মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে আরজ ফকিরের গানটা শোনে। আগেও শুনেছে। সব অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয় না, শব্দও হয়তো ঠিক মতো ধরতে পারে না। ধানহাটায় ফকিরের আখড়ার পাশে এসে দাঁড়ায়। নামাজ শুরু হতে দশ পনের মিনিট। আরজ ফকিরের চিবুকে ছড়ানো হাসি। বেলাল হুজুরের মুখে হাসি নাই। হুজুরের এক হাত কোমরে, অন্য হাত কাঁচাপাকা দাড়িতে। সাদা লুঙির ওপর সাদা হাতওয়ালা গেঞ্জি, পায়ে টায়ারের চটি। বলে, বুজলাম না, কি গাও।
আরজ ফকির মুখে হাসি ধরে রেখেই একতারার তারে দুইবার টুনটুন করে।

বেলাল হুজুর আবার বলে, মানেটা কও দেহি।

মুখ্যসুখ্য আনপার ফকির আমি, মানে আমিও বুজি না।

তয় গাও ক্যা ?

গাই আনন্দে। আনন্দ হয় তো তাই। মুর্শিদ বাবা কয়, জানটা তার দান, জানে কষ্ট দিলে তার কষ্ট হয়।

বুজরকি রাহো, মানে কি কও।

ফকির আবার টুনটুন করে বাজায়। আছর ওয়াক্তের ভরা হাটের শোরগোলের মধ্যে একতারার বাজনা ধুলায় মিশে নাই হয়ে যায়। ফকির বলে, এই বাজনার মানে বুঝেন ?

বেলাল হুজুর চুপ থাকে। ফকির বলে,

কোনো মানে নাই। আবার মানে আছেও। মিষ্টি সুর শুনলে মন ভালো হয়। ইচ্ছা করলে এই বাজনার দানায় দানায় কথা বসায় দিতে পারেন। আবার না বসাইয়া বাজনার মানে ওই কথার মানে ধইরা নিলেও নিয়া যায়। যার যেমন সাধনা।

অতো কথা বাড়াও ক্যা ? তোমার গানের মানে তুমি কি বুজো সেইডা কও। খাওজানি প্যাচালের সময় নাই।

ফকিরের চিবুকে হাসি থমকে থাকে। হাতের আঙুল বাজনা থেকে পিছলে যায়, বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে,
কোন কথাটার মানে জানতে চান ?

নিরাকারের আকার মানুষ রসুল দেখে, নাইদেহের আদল কি জানি গাও ?

ও, হুজুর এইগুলি দামি কোনো কথা না, না শুনলেও পারেন আমাগো তরিকার কথা।

একটু শুনবার চাই, কও দেহি।

নিরাকার খোদারে মানুষ কেমায় দেখে। যদি দেখেই তয় তার আকার আদল নিশ্চয়ই আছে কি কন হুজুর ? দুই রকমের ছলনা আছে। যদি তেনার আকার থাকেই তয় নিরাকার হইলো না, আর নিরাকার হইলে পয়গম্বর তারে দ্যাহে নাই।
নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ, ওস্তাগফিরুল্লা .... এতো বড় সাজা পাইলি, তাও তোর শিক্ষা হইলো না। অহনো নফরমানি করতে তোর সাহস হয়!

ফকির মুখে হাসি ফিরিয়ে আনে।

সাজা না পাইলে সাজা দেওয়া হয় না হুজুর। মুর্শিদের লীলায় আমরা খালি সুখ আনন্দই খুঁজি, সাজা কহনো নেই না।

থাম বেতমিজ হারামখোর। গ্রামের মানুষ মিলা বিবি ছুটাই নিলো তাও তোর কিছু হইলো না !

দুই জিনিস কেউ কোনোদিন নিবার পারবে না। এক, আমার মুর্শিদ, দুই আমার বিবি। এই দুইই হইলো আমার সাধনার বস্তু। বিবি আমার সাথেই আছে। তার সাথে সহবাস হয়। মুর্শিদ আছে সিনায় সিনায়।

বেলাল হুজুর উল্টা দিকে থুতু ফেলে হনহন করে মসজিদের দিকে যায়, ফরজ আদায়ের জন্য হয়তো মুসল্লিরা কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। যেতে যেতেও হুজুর ওয়াস্তাগফিরুল্লা... পড়ে।

ধানহাটার যে সব মানুষ চোখ কান এবং জিব দিয়ে চেটে চেটে আরজ ফকির ও বেলাল হুজুরের বাহাসের স্বাদ নেয়, তারা পরেও নড়ে না। হুজুর আছরের জামাতে শরিক হয়ে গেলেও এই মানুষগুলি ফকিরের দিকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে। ভিড় করে দাঁড়ানো মানুষদের মধ্যে অনেকেই ফকিরের বিবি ছাড়িয়ে নেবার খবর জানে। অনেকে এখন জানল। এতোগুলো কৌতূহলী চোখের নিচে ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে কথা গানের আড্ডা জমাবার মতো উৎসাহ উবে গেছে। মুখ গলা ঘাড় মুছে ঝোলার মধ্যে গামছা ভরে, হাতের একতারা কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। তালেব মুন্সির দিকে চোখ ফেলে, রাইতে কথা কবানে। তালেব মুন্সি ডান কাঁধ নামিয়ে সম্মতি দেয়। তালেব মুন্সি অভ্যস্ত ভঙিতে হাঁটুভাঁজ করে থুতনি হাতে ঠেকিয়ে বসে ছিল। সেও বড় শ্বাস ফেলে উঠে পড়ে। তার বাইশ কেজি চাল এক গিরস্ত একবারেই কিনে নিয়েছিল। এখন শুধু ভালো ত্যাল আর পাঁচশ' কেরেস ত্যাল, পান তামাক কিনে বাসে চড়বে। ফুলসুতি থেকে ভাঙারহাট অনেক দুরের রাস্তা। তালেব মুন্সির ভাইপো রমযান ভ্যান রিক্সা চালাতে শুরু করার পর মুন্সি ভাঙারহাটে প্রায় নিয়মিত আসে। রমযান তাকে গ্রাম থেকে ঘারুয়া বাসস্ট্যাণ্ডে নামিয়ে দেয়। আবার মাগরেব ওয়াক্তের সময় ঘারুয়া থেকে ফুলসুতি। রমযানের ভ্যানে অবশ্য আরও অনেক প্যাসেঞ্জারই থাকে তবে তালেব চাচাকে সে শুধু মাগনা নেয়। আজ চাচার মুখ বেজার, একটা কথাও বলে না। পাশের মানুষ চেয়ারম্যান ইলেকশন, হরতাল, বাজারের দামাদাম নিয়ে কথা বলে, ইরির কেজি ষোলো টাহায় ঠেকছে, কি মুন্সি কত কইরা ব্যাচলা। তবুও তালেব মুন্সি মুখের আঠা আঠা ভাব কেটে মনের গোমর দুর করে বলতে পারে না। কলমির বেড়ার পাশ দিয়ে ঝাকি খেতে খেতে পুকুরপাড়ে এসে রমযান ভ্যান থামিয়ে বলে, চাচা নামো, কি অইলো, শরীল বালো ঠ্যাহে না ? তালেব মুন্সি ধামা নিয়ে নেমে বলে, বাসস্ট্যাণ্ডে ফকির আইলে আমারে খবর দিস বাবা। হাটভর্তি মানুষের সামনে গায়ে পড়ে ভালো মানুষটাকে ওইভাবে অপমান কেন করল হুজুর ! ফকিরের চেহারায় সে কষ্টের দাগ দেখেছে। বেলাল হুজুর বিবির খুটা দিয়া ঠিক করে নাই। বেহুদা বেহুদা ফকির মানুষটার পিছে লাগে ক্যা ! রমযানও ফকিরের ভক্ত, বাতেনি জাহিরির সে কিছু বোঝে না। ফকিরের কথা গান আর মানুষটা তার ভালো লাগে। তারামন বিবির স্বামী হিসেবে ফকির তার ভগ্নিপতি। এই আত্মীয় সম্পর্কের টানে নয়, রমযান তাকে ডাকে ফকির, কখনো কখনো ফকির বাবাও। এই মাঘে রমযান বিয়ে করবে। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। মেয়েদের পক্ষ আব্দার করেছিল দুইমাস পিছিয়ে দেয়ার। রমযান রাজি নয়। ফাল্গুন চৈত্রে চকে কাজ বেড়ে যায়। ইরি লাগানো, বোরোক্ষেতে গমক্ষেতে নিড়ানি, গরম, তার মধ্যে ভ্যান রিক্সা চালানো। রমযান পরিষ্কার বলে দিয়েছে, মাগেই বিয়া করব, দ্যাশে মাইয়ার অবাব নাই। মেয়ের বড়ভাই'র মালেয়শিয়া থেকে ফেরা না ফেরা রমযান বিবেচনা করতে নারাজ। আরজ ফকির রমযানের শত অনুরোধেও একখান মনের মতো গান বানাতে পারল না। ভাবি বউ পারুলের নামে গান না করে ফকির এমন সব গায়, বুঝতে গেলে রমযানের আউলাঝাউলা লাগে।

স্ত্রী আমার খোদা ভগবান
স্ত্রী আমার মুর্শিদ।

সিনায় সিনায় পয়দা করেন
নাই গণনা রশিদ।

আল্লা মাবুদ সৃষ্টি করেন
কেতাব সাক্ষ্য দেয়।
নারীর পেটে নারী পুরুষ
সনে সনে জন্ম নেয়।
আল্লা যদি হন স্রষ্টা
নারী তবে কী ?
নারী হলেন আল্লাতালার
আসল শরীকী।

রমযান গান শোনে, চোরাগোপ্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একসময় উদাস চোখে উঠে যায়। ফুলসুতি গ্রামে ফকির যেতে পারে না। কেউ দেখে ফেললে গ্রাম-বিচারের রায়ে জুতাপেটা করা হবে। জানেও মেরে ফেলতে পারে। আরজ ফকির বিচার সভায় ছিল। বিচারক ফতোয়াদানকারী হুজুর, আলেম এবং এদের আশেপাশের মানুষদের রক্তের ছটফটানি দেখেছে। মুনাফেক, কাফের, বেঈমান ইবলিস শয়তান ফকিরের জান কবজ করে অনেকেই সোয়াব আদায় করে নিতে কসুর করবে না। মামুলি বউবিবি ছাড়িয়ে নেয়া কোনো সাজা নয়। হুজুরের পবিত্র বাসনা ছিল দোড়রা মেরে ইবলিস শয়তানের ইহকাল নিপাত করে দেয়া হোক। শুধু তারামন বিবির আব্বা ঈমানদার এখলাস মুন্সির মিনতিতে তখনকার মতো জান কবজ করার ফতোয়া জারি করা থেকে বিরত থাকে। তবে ইবলিস শয়তান এই পবিত্র গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করলে জুতাপিটার শাস্তি দেয়া হয়। জুতাপিটায় যদি হারামি মরে, আলহামদুল্লিাহ। পিছনে একতারাটি গামছা দিয়ে ঢেকে ফকির হাঁটু ভেঙে বসেছিল। বাদ মাগরেবের বিচার এশার পরেও চলছে। এশার নামাজের বিরতি অবশ্য দেয়া হয়েছে। ফকির নিজেকে বাঁচাবার জন্য যুক্তি জাহির করতে আগ্রহী ছিল না। তবুও, বারবার শয়তান শয়তান শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলার জন্য বিনয়ের সাথে অনুমতি চায়। হুজুরের দয়ার শরীর, উপরন্তু নামকরা আলেম। তার সদয় অনুমতি পেয়ে ফকির একতারা ছাড়া খাপছাড়াভাবে হাতের ওপর হাত রেখে শয়তানের পক্ষে একটু ওকালতি করার চেষ্টা করে, হুজুর সাহেব, আমার বেয়াদবি নিবেন না। আপনার দেয়া যে কোনো বিধান আমি মাইনা নিব, অলরেডি মাইনা নিছি। কিন্তু একখান কথা আপনার কাছ থিকা বুঝবার চাই। শয়তান কিডা, শয়তানরে কে শয়তান বানাইলো, আর শয়তান না বানাইলে কেমনে হইতো বিচার-আচার, দোজখ বেহেস্ত ? অতি খোদাভক্ত, খোদার কুদরতের নুরে বানানো প্রিয় ফেরেস্তা মকরমই ইবলিস শয়তান। কেমায় আল্লার ফেরেস্তা শয়তান হইয়া গেল ? এই মকরম ফেরেস্তা জগতের সকল জমিনে সেজদা কইরা গেছেন। কিতাবে বলে, এতটুকু জমিও নাকি বাকি ছিল না যেখানে মকরম ফেরেস্তার সেজদা পড়ে নাই। কিন্তু এই অতি ঈমানদার ফেরেস্তা আল্লার আদেশেও বাবা আদমকে সেজদা করেন নাই। ফেরেস্তার বাবার সাধ্যি আছে আল্লার হুকুমের নয়ছয় করে ? আল্লাতালাই অতিভক্ত মকরমকে পছন্দ করিয়াছিলেন তার মনের ইচ্ছা পুরণ করিতে। মকরম সেই ইচ্ছার কারণেই আদমকে সেজদা করেন নাই। তখন আল্লাতালা তাকে দুনিয়ায় মানুষের ঈমান আমান মনুষ্যত্বের পিছনে লাগাইয়া দেন। ফেরেস্তা মকরম ওরফে ইবলিস শয়তান আল্লাতালার দরকারেই কাজ কইরা চলতেছে। এই বিচার-সভাতেও সেই মকরম ফেরেস্তা আছেন। আমি খুবই আল্লাদিত, হুজুর, আপনি আমারে বারবার সেই ফেরেস্তার নামেই ডাকতেছেন। হিন্দু ধর্মে অবতার আছে, কে জানে আমি হয়তো মকরম ফেরেস্তার অবতার হইয়া পড়ছি, হে হে হে...।

হুজুর এতক্ষণে কলিজা চিরা ধমকে লাফিয়ে ওঠে, খামোশ, তোর জিব্বা টাইনা ছিড়া ফেলাবো। আমারে ছবক দিবার চাও ! আরজ ফকির ঠোঁটের চতুর্পাশ ঘিরে হাসি বিছিয়ে রেখে আগের মতো বসে। বিচার সভা কিছুক্ষণ নিঃশব্দ মুখ থুবড়ে থাকে। আরজ ফকিরের বিরুদ্ধে আসল অভিযোগ মহা-বেশরিয়তি গানা বাজনা করা, ওই সব শয়তানি গানে মানুষের ঈমান কোমজোর হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকেই এই ফতোয়া সভা। ফকিরের কোনো গানে ছিল, পরে ফকির গল্প কথায় গানের ব্যাখ্যা দিয়েছে। সেই ব্যাখ্যা এবং গান মসজিদের নিয়মিত মুছল্লিদের বিব্রত না করে পারে না। তারা এখলাস মুন্সিকে সাবধান করে দেয়। এখলাস মুন্সির কথা মুর্শিদবন্দি আরজ ফকির শুনতে যাবে কেন ! বরং এখলাস মুন্সিই হুক্কা টানতে টানতে ফকিরের গান শোনে, গানের ভাবে ও কথায় অজান্তে তালও ঠুকে ফেলে। ফকির গানের হেঁয়ালি রেখে সোজাসাপ্টা কথায় বলে, ভাই দেখেন, বিবি মরিয়মের কথা। বেচারি মরিয়ম ! জেরুজালেমের মন্দিরের সেবাইত পুরোহিত হজরত জাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে মরিয়মের বাবা এমরান মরিয়মকে রাইখা আইছিলেন। হজরত জাকারিয়া আঃ ওরফে সখরিয়া ছিলেন ইহুদীদের ধর্মযাজক ও জেরুজালেম

মন্দিরের সেবাইত, তা আগেই কইছি। সেই সময় মরিয়মের বয়স ছিল তিন বছর। তিন বছরের শিশুকে নিঃসন্তান সখরিয়া লালনপালন করেন।

অতঃপরে মরিয়ম আচক্কা গর্ভবতী হইয়া গেলে মানুষের ভয়ে সমাজের ভয়ে সখরিয়া মন্দির ছাইরা জ্ঞাতিভাই যোসেপের সঙ্গে জেরুজালেমের কাছেই বয়তুলহামে যাইয়া থাকে। ওইখানেই খেজুর গাছের ছায়ায় হজরত ঈসা আঃ জন্মগ্রহণ করলেন। অবিবাহিত মরিয়েমের গর্ভে পুত্র সন্তানের জন্ম হইয়াছে শুনিয়া সখরিয়া এবং ওই মরিয়মেরই স্বজাতি ইহুদীরা বেদম খেইপা যায়। তারা মরিয়মের পালক পিতা সখরিয়াকে ব্যভিচারের দোষে হত্যা করে। বুড়া সখরিয়া নিজেও নিঃসন্তান ছিলেন, পরে একশ কুড়ি বছরের বন্ধ্যা বউ বুড়ি ইলীশাবেতের গর্ভে ফেরেস্তার মাধ্যমে পুত্রবর পাইয়া পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছিলেন। তার ছয় মাস পর ১৬ বছরের কুমারী মরিয়মও গর্ভবতী হইলেন। ব্যভিচারের দোষে সখরিয়াকে হত্যা করার ঘটনাটাও বলার মতো। ভয়ে বেচারা সখরিয়া একটা গাছের কোটরের ভিতর লুকাই ছিল। ইহুদীরা বুঝতে পাইরা করাত চালাইয়া ওই গাছ দুই ভাগ কইরা ফেলায়। সাথে সাথে বৃদ্ধ সখরিয়াও দুই ভাগ হইয়া মরে। কুমারি মরিয়মের গর্ভে সন্তান পয়দা করার দায়ে দোষী করে সখরিয়াকে খুন করা হইলো। মরিয়ম তখন মিশর হইয়া গালীল প্রদেশের নাসরৎ শহরে পালায়। তহন সেই দেশের রাজা হেরোদ ধর্মে ইহুদী। রাজ্য চলত তৌরিতের মতে। ব্যভিচার নরহত্যা সেইখানে মহাগুনা। মরা ছাড়া উপায় নাই। সখরিয়া যদি অপরাধী না হইতো তাইলে তার মত গণ্যমান্য ব্যক্তিকে মারার জন্য কোনো বিচার হইলো না কেন, কন ! কারণ !

কারণ —— শুক্রকীট নয়তোরে কীট
পয়দা হইতে লাগে
ডিম্বকোষে শুক্রকীটে মিলন ঘটিলে
মানুষের জন্ম তখন কতই সময় লাগে !
আদম বাবার শুক্রবীজে
হাওয়া বিবি ডিম্ব ফুটান।
আল্লাতালার মর্জি হলে
শুক্রকীটে কি দরকার ?
হাকিম হুকুম তলব কইরা
বাচ্চা হোক বেশুমার।

এখলাস মুন্সি চাষাভুষা মানুষ। যেভাবেই শুনে থাকুক কিন্ত হুজুর, মুছল্লি চোখেমুখে আনন্দের বাতি জ্বালিয়ে এই গল্প গান হজম করে নাই। একে একে ফকিরের বেশরিয়তি কাজকর্মের তালিকা বানিয়ে বিচারের আয়োজন করে। শরিয়ামতে বা আইনত হুজুর সাহেব ফতোয়া দিতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন নিয়ে কারো চিন্তা করার কথা নয়। আরজ ফকির নিজেই একবার ফতোয়া জারি করার আগে মনে করিয়ে দিতে চায়, হুজুর দেশে কিন্তু ফতোয়া জারি করার আইন নাই। আদালতের বাইরে কিছু করবার পারেন না। তখন হুজুরের খামোশ ধমকের ধাক্কায় ফকির হাঁটুভেঙে বসে পড়ে, ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে। সেই হাসির দিকে তাকিয়ে হুজুর সাতজন ঈমানদার মানুষের সামনে ১০১ ঘা বেত মারার আদেশ দেয়। তবে যদি ১০১-এর আগেই কাফেরের পাপজন্মের ইহলীলা খতম হইয়া যায়, তাইলে মুর্দার শরীরে আজাবের দরকার নাই। হুজুরের মনে দয়া হয়। তখন এখলাস মুন্সি হুজুরের পা জড়িয়ে ধরে তার মেয়েকে অকালে বিধবা না করার জন্য হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। এখলাস মুন্সির কান্নায় অনেকে একটু নড়েচড়ে বসে, খুকখুক করে কাশে, হাত কচলায়, আর আরজ ফকির একই রকম হাসে। গত দুইবারের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনে ফেল করা মেম্বর সেকেন বলে, ফকির মানুষতো তেমুন কোনো ক্ষতি করে নাই, আমাগো ঈমান আকিদা টলাবার ক্ষেমতা ওই হারামজাদার নাই, আপনি সাজা একটু কমায় দেন। এখলাস মুন্সির কান্নায় তখন সুর তৈরি হয়। তালেব মুন্সি এসে তাকে ধরে। হুজুর তখন সভার দিকে চেয়ে ফতোয়া বদলায়, ঠিক আছে, আমার আল্লাহ সাক্ষী, আপনাগো অনুরোধে ফতোয়ার বিধান বদলাইলে আল্লাহ য্যান মাফ কইরা দেন। সেকেন বলে, দেন হুজুর, গরীব মানুষ। হুজুর তখন মুহুর্ত চুপ থেকে এখলাস মুন্সির দিকে শ্যেন দৃষ্টি ফেলে বলে, মুন্সি, বাপ হইয়া মাইয়ার জন্য কানতেছো, আল্লাহ তোমার আর্জি শুনবেন, সবই তিনি দেখতেছেন, তার হুকুম ছাড়া কিছুই হবার নাই। তুমি তোমার মাইয়ারে আর ফকিরের সাথে রাখবার পারবা না। ওরে ছাড়াই আনো, আর ওই বেটা ফকির তোরে এই গ্রামের ত্রিসীমানায় দেখলে জুতাপিটা করা হবে, জুতাপিটায় মইরা গেলে কাফের হত্যার সোয়াব মিলবে। আল্লাহতালা পবিত্র কোরানেও এই জাতের ইবলিস শয়তান সম্পর্কে কঠিন বিধান জারি করিয়াছেন। বেঈমান কবিদের বিষয়ে আল্লা ফরমাইয়াছেন ..., হঠাৎ হুজুরের গলায় ওয়াজের সুর দোলা

দেয়, পবিত্র কোরআনের সুরা আশ শোয়ারায় আছে, ওদের ওপর শয়তান ভর করে থাকে, শোনা কথা মিথ্যা কথা বলে মানুষের ঈমান নষ্ট করে। ওরা মিথ্যাবাদী, পাপী গোনাগার মানুষই ওদের সাথে থাকে।

বিচারসভার মানুষ মুহূর্তকাল চুপ থেকে গুনগুন শুরু করে দেয়। তাদের মিলিত কথার কোনো আকার তৈরি হয় না। সব গুঞ্জন ছাপিয়ে মেম্বর সেকেন বলে, হুজুর ফতোয়াডা যুৎসই অইছে। সাপ মরবে, কিন্তু লাঠি ভাঙবে না। যাও মুন্সি ঘরে যাও, মাইয়ারে কাফেরের ঘর থিকা ছাড়াই আনার ব্যবস্তা কর, দরকার অইলে আমারে কইও। ফকির তখনো একইভাবে বসে ছিল। তার জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দ বা তারামন বিবিকে ছাড়িয়ে নেয়ার ফতোয়ায় কোনো ভাবান্তর হয়েছে কিনা তা এই গ্রামীণ রাতের একটা হ্যাজাকের আলোতে তত পরিষ্কার বোঝা যায় না। ফকির একসময় ওঠে। এখলাস মুন্সিকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বলে, আব্বা, আমি চইলা যাইতেছি. তারামনরে দেইহেন। বিচারের লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার আগেই কাঁধে একতারা ঝুলিয়ে ফকির অন্ধকারে মিশে যায়। কেউ কেউ বলে, ফকির বিচার থিকা সোজা তারামন বিবির সাতে দেহা কইরা তয় গেছে। কি কথা তারামন বিবির সাথে হয়েছিল তা অবশ্য কেউ বলে না। আজব কথা হলো, এতোবড় বিচার হওয়ার পরও তারামন বিবির ঠোঁটেও ফকিরের মতো হাসি ছিল। স্বামী থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার ফতোয়া পেয়েও তার হাসি মরেনি। বরং ফকিরের কোনো কোনো গান গুনগুন করে গায় আর হাসে। আমার স্বামী তো পাবলিক না, ফহির মানুষ, চাইলেই কাজী মোলোবি ছাড়াই দিবার পারবে না। কেন পারবে না ? ফকিরের আলাদা কি মাজেজা আছে ? এসব প্রশ্ন কেউ অবশ্য করে না। তারামন বিবি নিজেই নিজেকে বলে, কেউ শুনলে শুনতে পারে, সে দায় তার নয়, ফহিরের সাতে আমার হইলো বাতাসের সম্পর্ক। বাতাস দেহা যায় না কিন্তুক দেহে মনে লাইগা রইছে, জান বাচাই রাখছে। বিচারের হুজুর পারবে বাতাসরে ছাড়াই নিবার ? হগল হুমায় বাতাস আমার সাতে লাইগাই রইছে। বাতাস আমার ফহির স্বামী। বাতাস তোর প্যাট বানাইবার পারবে ? হু পারবে, চাইলেই পারবে।

আরজ ফকির তার মতো করে ফতোয়া মেনে নিয়েছিল। তার ঠোঁটের কোণে এমন একটা হাসি ফুটে ওঠে, মনে হয় মেনে নেয়া না নেয়ার কোনো তফাৎ নাই। তবে ফকিরকে আর ফুলসুতিমুখি হতে কেউ দেখেনি। এখলাস মুন্সি বা অন্য কেউ ঘটা করে তারামন বিবির তালাকের ব্যবস্থা করতেও ব্যস্ত হয় না। ফুলসুতি এবং আশেপাশে গ্রামের মানুষের সাথে ফকিরের হাটেবাজারে দেখা হয়, হাসিমুখে কথাবার্তা চলে। কথায় কথায় দুইএক লাইন গেয়েও শোনায়। আর ধানহাটায় তো ফকির নিয়মিত আড্ডা জমাতে আসেই। কুমারনদের এই অসমাপ্ত বাঁকের মুখে থানা মাদ্রাসা গোরস্তানের মোহনায় হাটের চেনা-অচেনা ভিড়ে আরজ ফকির কেমন একটানে হাট জমে ওঠার আগেই গান কথা হাসি ঠাট্টায় নিজেই মজে যায়। এসবের ফাঁকে ফাঁকে তালেব মুন্সির খোঁজ চলে। তালেব মুন্সিও হাটে আসে। একধামা চাউল, দুইহালি হাসের ডিম বিক্রি বা পান-তামাক ভালো তেলের জন্য এতো দুরের হাটে আসবার তার গরজও কম না। তালেব মুন্সির সাথে একবার ফকিরের চোখাচোখি হয়ে যাওয়ার পর ফকিরের গলার সুর বাজনার তারে আঙুলের কাজ আলাদা হয়ে গেলেও কি অন্যরা বুঝত ! ফকির বলে, শোনো,

হাতে গড়া মাটির ময়না
সোনালী রূপালী ডানা
(ভাইরে) ইচ্ছা হলে মনের গয়না
পরাও তোমার সোনা।
মাটির ময়না আহা অপরূপ
চোখ দুটি তার টানা

এবার মানুষ বুঝাও স্বরূপ
কেমন ময়না খানা।
(ভাইরে) আঁকা চোখে কিছু আলো
পারলে তৈয়ার করো
নাইলে বড়াই মিথ্যা ছাড়ো।
কানা ময়নার দৃষ্টি যদি নাই পারলা দিতে
কেমনে হইলা আশরাফ তুমি
ফকির তাহার কিছুই না বোঝে।

ওই জ্যোতি ওই দৃষ্টি হইলো এলেম, এই এলেমের ছবক পাবা মুর্শিদের কাছে। মুর্শিদ বিনা মা--নুষের হুস হয় না। ওই মাটির ময়নার মতো সোন্দর দুইটা চোউখ থাকতেও আন্ধা কানা। আছর শেষে বেলা আরো পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। গাছের মানুষের ছায়া বড় বড় হতে হতে গ্রাস করে নিয়েছে সব। শুধু নদীর কাঁধে মাথায় সোনালী রোদের ঝিলিক মিলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় তিরতির করে কাঁপছে। আরজ ফকিরকে ঘিরে থাকা মানুষদের হাট সদাইও শেষ। তাদেরও চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তখন মাদ্রাসা থেকে বেলাল হুজুর, সাথে সাত-আটজন মাদ্রাসার তালবে এলেম এসে দাঁড়ায়। আরজ ফকির বেলাল হুজুরকে দেখে। তার সঙ্গের নতুন গজানো চিকন চিকন গোঁফ দাড়ির সরুসরু ছাত্রদেরও দেখে। দেখেও তার কথায় কোনো কমাও বসায় না। একই তালে বলে যায়, আন্ধা মানুষ শরীলে যত বাহারি কাপড় দিয়া মুড়াইয়া রাহুক, যতই সুরমা আতুর সুগন্ধি মাইখা থাকুক, ভাইরে সেই দৃষ্টি না থাকলে তার কি দাম আছে কন ? দৃষ্টি হইলো জান, আত্মা পরাণ, সেই দৃষ্টির পয়দা জরুরি। দৃষ্টি কিন্তু চোখে না, চোখের ভিতরে চোখ, বেবাক মানুষেরই চোখ আছে। দৃষ্টি আছে কজনার ? বেলাল হুজুর তখন আসন্ন সন্ধ্যা কাঁপিয়ে জানতে চায়, তার এক হাত লুঙির কোঁচায় অন্য হাত শূন্যে, ওই ফহির, শয়তানের আড়ত, তোর দৃষ্টির কথা ক। উপস্থিত মানুষ একসঙ্গে বেলাল হুজুরের দিকে তাকায়, তার সঙ্গীদের দেখে। আরজ ফকির মাটির দিকে চোখ নামিয়ে আবার মুখ তোলে কিছু একটা বলার জন্য। বেলাল হুজুর তখন হাটুরে মানুষদের উদ্দেশ্যে বলে, শুনো তোমরা, এই বেটা সাক্ষাৎ শয়তান। ইমানদারের ইমান নিয়া ঠাট্টা-তামাসা করে। কোরান-রসুল নিয়া কুফরি প্রচার করে। এই হাটে ওর ঢোকা বন্ধ কইরা দিলাম। সামনের হাটথন শয়তানের ছবক তোমাগো শোনা লাগবে না। বেলাল হুজুরের সাথের ছাত্ররা কজন তখন হুজুরকে পিছনে রেখে সামনে এগিয়ে আসে। হুজুর বলে যায়, ওই ফহির ভাগ, এহনই পালা, নাইলে নদীতে চুবাইয়া তোর জীবন লীলা সাঙ্গ কইরা দিব। ভিড়ের মানুষের মতো আরজ ফকিরও দেখে হুজুরের সঙ্গীদের কারো কারো হাতে সাইকেলের চেইন প্যাঁচানো, কারো হাতে গাবগাছের কাঠ দিয়ে বানানো ক্রিকেটের ব্যাট। ফকির আবার মাথা নিচু করে কাঁধের পাশে তার একতারা ঠেলে মৃদু গলায় বলে, সরকারি হাট থিকা তারাবার কোনো অধিকার আফনের নাই। বেলাল হুজুর সেই কথাও শোনে, সরকারের কথাই তোরে কইলাম। আমাগো কথাই সরকারের কথা, পারলে থানায় গিয়া নালিশ কর গা যা। তোর বিয়া করা বউ ছুটাই নিলো, গ্রামছাড়া করলো, তোর সরকারে কিছু করবার পারছে ? ইমানদার মানুষে ভোট দিয়া সরকার বানাইছে, তোর মতো শয়তান কাফেরকে লাই দিবার জন্য না। বেলাল হুজুর একটু থামলেই ফকির চোখ তোলে। তার চোখের পরিসর লাল, বলে, হুজুর, সরকারের কথাডা হাছাই, কিন্তু একখান অসত্য কথা হইলো আমার বউরে কেউ ছাড়াই নিবার পারে নাই, নিত্যি রাইতেই বউর সাতে সহবাস হয়। গ্রামের মানুষও আমারে তারায় নাই, দেহেন এই বেবাক মানুষই আমার বউর গ্রামের, আমার আফনের গ্রামের। বেলাল হুজুরের গলায় ধমক ধরা, কথা বারাবি না মিথ্যাবাদি লম্পট, বউর গ্রামের মুহে গেলেই তোরে জুতাপিটা কইরা খতম করবে। ফকিরের মুখে হাসি ফিরে আসে, কিন্তু আমার বউ যে আমার সাতেই রাইতে ঘুমায়। জুতাপিটা করবার তো কেউ আসে না, সেই ক্ষমতা কারো নাই, তোমার মতো দুই পাতা ছেপারা পরা কানা হুজুরের ছায়াও তো দেখলাম না। ভিড়ের ভিতর থেকে একজন এগিয়ে বলে, এইডা ঠিক কইলা না ফহির। সেই বিচারের পর তুমি ফুলসুতি গ্রামে ঢুকপার পারো নাই। এখলাস মুন্সির পাশের বাড়িই আমার তুমি জানো। ফকির তেমনি হাসে, জাহিরি মাইনসের এই হইলো সমস্যা। বেবাক কিছু জাহির না হইলে চলে না, আবার কিছু না দেইখা না শুইনাই পাঁচবেলা হোগলার চাটাইয়ে মাথা ঠুকে। তমিজের সাথে কথা ক। ফকির আর কি তমিজের সাথে কথা বলবে, বলে, আমার বউ তারামন বিবির সাথে প্রতিরাতেই সহবাস হয়। প্রমাণ চাইলে শুনেন, সামনের দুই তিন মাসের মধ্যেই বউ আমার বীর্যধারণ কইরা গর্ভবতী হবে। এখলাস মুন্সির প্রতিবেশী বলে, আমরাও দেইহা নিব, দারা। কাইলই তোরে তালাক দেয়াবো।

তালাক দেয়া হয় না। ফুলসুতি গ্রামের সবাই জানে ফকির ফতোয়া জারির পর কখনো গ্রামে ঢোকেনি। তারামন বিবিও বাড়ির থেকে কোথাও যায়নি। এখলাস মুন্সি মেম্বার, মসজিদের হুজুর, আরও দুই একজন মান্য ব্যক্তিদের অনুরোধ করে তালাক ঠেকিয়ে রেখে বলেছে, আরজরে বেশরিয়তি পথ থিকা ফিরাই আনব। যদি নাই আনবার পারি, তহন মাইয়ার কপালে যা আছে অবে। একটু সময় দ্যান। এই সময় দেয়াতে কারও কোনো অসুবিধা হয়নি। উৎসাহি মানুষের কৌতূহল এবং নজর আছে তারামন বিবির ওপর। তারামনও কখনো তেমন চেষ্টা করেনি বাড়ির বাইরে যাওয়ার, রাতের অন্ধকারেও না। আরজ ফকিরকেও কেউ গ্রামে দেখেনি, অন্ধকারেও না। শুধু দুই একবার কেউ কেউ তাকে ঘারুয়া বাসস্ট্যাণ্ডে দেখেছে অন্য অনেক মানুষের সাথে, যারা ফকিরের গান শুনতে ঘিরে ধরে বসেছিল।

এখলাস মুন্সির একচিলতা উঠানের শেষে, দক্ষিণে ঢালুর দিকে একটা কুলবরই গাছ, তার তলে ছাইগাদা ফুড়ে বড় বড় পাতার ভ্যান্না গাছ অল্প বাতাসেই খলবল করে। এক সকালে ভ্যান্না পাতার দিকে চেয়ে কপাল ধরে বসে পড়ে তারামন বিবি। এক হাত দিয়ে পেট ডলে, গা গুলায়, বমি করে। অস্বস্তি তাড়াতে চায়। না, বমি বমি ভাব থেকেই গেল। মুখে খাবারও দিতে পারে না। সব কিছুতেই গন্ধ লাগে। কাঁচা কুসা কুল মুখে ফেলে চিবালে বরং ভালো লাগছে। খবর হতে সময় লাগলো না। সাত মাস হলো ফকিরের কাছ থেকে তারামনকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। তারামনও আলাদা থাকার জন্য মন খারাপ করেনি। ফকিরও গ্রামে ঢোকেনি বলে সবাই জানে। আর বড়ো কথা হলো হাটের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করার দুইমাসের মধ্যেই তারামন বিবি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। এখলাস মুন্সি গালে হাত দিয়ে বসে, এখন কি হবে, মুখ দেহাই কেমায় ! মুখ

দেখাতে তাকে কসরত করতে হয় না। গ্রামের মানুষই এসে দেখে যায়। ফকির ছাড়া আর কেউ আছে কিনা দ্বিধা বিনাদ্বিধায় সেই খোঁজ ও সন্দেহও অনেকে করে যায়। তারামন হাসে, কিছুটা মলিন তার হাসি। শরীলডা খালি গুলায়, খাইতে পারি না। মাগী কেমায় প্যাট বানাইলি ? মাইনে, আমার স্বোয়ামী আছে না, তোমার ছাওয়াল কিডা পয়দা কইরা গেছে কেউ জিগাইছে ? স্বোয়ামী পাইলি কুথায় ? ফহির বেটা কবেরথনই তো আসে না ! ও, হইতে পারে তোমার কাছে যায় না, কিন্তু আমি তার লাগে পতি রাইতেই গুমাই। কুতায় গুমাস ? তার দেহের মদ্যে। থাম, বেশি কতা কইস না। শোনো, তোমাগো হুজুররা যদি তালাকও করাই দিত, তেমু সেই থাকতো আমার সব। আমার প্যাটে তারই বাচ্চা জন্মাইতো, বুজলা। কে কেমন বুঝলো তা বলা তত সহজ না। তাতে তারামনের কিছু আসে যায় না। কিন্তু ধানহাটায় আরজ ফকির আর আড্ডা জমাতে আসেনি। কোথাও সে তেমন আড্ডা জমায়ওনি। হাঁটাপথে, চায়ের দোকানে, নিজের গ্রামে এমন কি ফুলসুতি গ্রামে বাসে করে যেতে হলে যে বাস স্টেশনে নামতে হয় সেই ঘারুয়ায় একবারই কথা গান হাসি ঠাট্টায় ফকিরি তরিকার জব-সাওয়াল করেছে। তারামন বিবির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর পেয়ে সে তেমন বাড়তি হাসেনি। তার নিত্য হাসির সাথে শুধু মনের উচ্ছ্বাসের মিশাল দিয়ে বলেছে কথা, কখনো গানের কলি আফছে এসে গেছে। সেই গান আগে বহুবার গেয়েছেও,

স্ত্রী আমার খোদা ভগবান
স্ত্রী আমার মুর্শিদ
সিনায় সিনায় পয়দা করেন
নাই গণনা রশিদ। ....

বেলাল হুজুর তোমারে কইছিলাম, বউ আমার সাথে প্রতিরাইতেই সহবাস করে। সামনের দুইতিনমাসের মধ্যে বউ আমার পোয়াতি হবে। দেহ আমার কথা সঠিক কিনা !

আরজ ফকিরের কথা টায়টায় ঠিক, তাতেই কি সব ঠিক হয়ে যায় ! এবার বিষয় ফকির নয়, এখলাস মুন্সি এবং তার মেয়ে তারামন বিবি। তারামন বিবির কথা কেউ পাত্তা দেয় না। আর এখলাস মুন্সি কথা বলতে পারে না। কি বলবে সে ! আরজ ফকিরই বলে, বিচার আইন ধর্ম অনুযায়ী তারামনই আমার বউ, তার গর্ভে আমারই সন্তান পয়দা হইতেছে। এইহানে কোনো কিন্তু নাই। যাগো মনে কিন্তু কিন্তু হয় তারা তাগো বাচ্চার মায়ের কাছে যাইয়া জিগায়তে পারে বাচ্চার বাপ আসলে কিডা ! বাচ্চার মা ঠিক আছে, কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু বাপের খোঁজের দরকার হয়। লোকে ফকিরের কথায় বিরক্ত হয়, ফালতু কথা ছারো, বউর সাথে তোমার দেহা হয় না কয় মাস হইয়া গেল, সেই বউ কেমনে পোয়াতি হয় ? কিডা কইলো হয় না ? যাও বেলাল হুজুরসহ তাবত হুজুরগো জিগাও গিয়া কোন বেটা ছিল মরিয়মের বাচ্চার বাপ ? কিডা ছিল হজরত জাকারিয়ার বন্ধ্যা বুড়ি বউ ইলীশাবেতের বাচ্চার বাপ ? উত্তর একটাই, আল্লাহর ইচ্ছা, ফেরেস্তার মারফত বর পাইয়া...। মরিয়ম, ইলীশাবেত প্রত্যেকেই মানুষ, রক্তমাংসে মানুষ, বাপ-মায়ে জন্ম-দেয়া মানুষ। তারা কেউই আসমান থেকে পড়ে নাই, পানির থিকাও উইঠা আসে নাই, আগুন থিকাও না। আরজ ফকির তার বউ তারামন বিবিও মানুষ। এতো কতা কেন জিগাও ? আল্লাহর কুদরতে তোমাগে বিশ্বাস নাই !